# সুকান্ত: কলকাতায়, কবিতায়

দেবরাজ দেবনাথ

সুকান্ত যদ্দিনে জন্ম নেন তদ্দিনে কলকাতা আর দেশের রাজধানী নেই। কলকাতা মহানগর গড়ে উঠেছিল বণিকের মন নিয়ে। বাণিজ্য অবাধ হবে এই ছিল তার মোটিফ, মোডাস অপারেন্ড-ও তাই। রিফাইন করা সভ্যতার ছিঁটেফোঁটা কলকাতার 'নেটিভ' মানুষকে ছুঁতে পারছিল দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। গাঁয়ের জমিদার মহানগরের রোশনাইতে মজতে চলে আসে। ফুলেফেঁপে ওঠে কলকাতা। হঠাৎ বড়লোকদের আস্তানা হয় কলকাতা। কলকাতার হাওয়া বাতাসে টাকা উড়ে বেড়ায়। উড়ে বেড়ায় সম্মান, শিক্ষা, সামাজিক মযর্াদাবৃদ্ধির সিঁড়ি হয় কলকাতা। আবার অমিত বৈভবের প্রদশর্নশালাও হয়ে ওঠে কলকাতা। জমিদার আসে। ব্যবসায়ীরা আসে। ছোটবড় কারখানা হয় এদিক ওদিক। তার সঙ্গে পালে পালে আসে ব্রিটিশ ঔদাযের্ কোমর ভেঙে যাওয়া বাংলার কৃষিসমাজের অসংখ্য মানুষ, নিজেদের বংশানুক্রমিক কাজ হারিয়ে নতুন কাজের খোঁজে। নানান স্কুল-কলেজের দৌলতে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণিও সংখ্যায় বেড়ে ওঠে পিলপিল করে।

তারই মাঝে দাঙ্গা, ব্রিটিশ অপশাসন, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা, দুই মহাযুদ্ধের মাঝে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে পড়া, অথর্নৈতিক মন্দা, তার হাত ধরে দুভির্ক্ষ, মহামারি। এই সব কিছুর মধ্যে জন্ম নেয় সুকান্ত। বেড়ে ওঠে কলকাতাকে ভালোবাসতে বাসতে। বন্ধু অরুণাচল দত্তকে কিশোর সুকান্ত লিখেছিলেন এক চিঠিতে,

"কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, একটা রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গভের্ জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পুথিবীতে থাকব না, কিন্তু এই মুহূর্তে পযর্ন্ত আমি যে কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি!"

কলকাতার প্রতি ছিল সুকান্তের আন্তরিক দরদ। কলকাতা ছিল সুকান্তের মায়ের কোল। কলকাতার সান্নিধ্যে থেকেই সুকান্তের বিশ্বদর্শন, জীবনবোধ, মননশীলতার উন্মেষ। সুকান্ত দেখেছিলেন কলকাতার অমিত সম্ভাবনার কথা। দেখেছিলেন কলকাতা কীভাবে মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের কারিগর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যাসিবাদ যখন বিশ্বযুদ্ধের হাহাকারে কলকাতাকে গিলে খেতে চাইছে, জাপানি সেনার আক্রমণের ভয়ে কলকাতা তটস্থ, তখন কলকাতার আপন সন্তান সুকান্ত লিখছেন,

"১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গভের্, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?"

সুকান্ত বিশ্বাস করতে চান না যে ধ্বংসই অন্তিম পরিণতি। হতাশা, নৈরাশ্য, অন্ধকার কলকাতার তরুণ মনকে তখন গ্রাস করেছে বিস্তর। 'ইনসিকিউরড ইয়ংস্টার' কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুকান্ত নিজে তাদের

একজন। তবু অন্ধকূপে তিনি চোখে ঠুলি পরে কাটাতে চাননি জীবন। মানুষ নিজে কিছু করতে পারে, গড়তে পারে, তা ছিল তার আজন্ম বিশ্বাস। জাপানি বিমানের ভয়ে শহর যখন ছন্নছাড়া, দুযেরাগ যখন ঘরের দোরগোড়ায় তখন সুকান্ত মানুষের বহিষ্ক্রমণের মাঝেও খুঁজে পেতেন জীবনের সন্ধান। বন্ধু অরুণকে সুকান্ত লিখছেন,

"কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নিজর্ন। তবে এই নিজর্নতা হবে উপভোগ্য—কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটা অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সাথর্ক হব। আর কলকাতার ভীষণতার প্রয়োজন এই জন্যে যে, এত আগন্তুকের স্থান হয়েছিল এই কলকাতায়, তার ফলে কলকাতা কাদের তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। একজন বিদেশী এলে সে বুঝতেই পারবে না, যতক্ষণ না তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে দেশটা কাদের। কারণ, যা ভীড়—তাতে মনে হয় দেশটা সকলের না-হোক, শহরটা সাবর্জনীন।"

কলকাতার প্রতি তার এই অপরিসীম প্রীতিবোধ কোনো গোঁড়ামি থেকে নয়। মনে হতে পারে কলকাতায় কাঙালের ভিড়, দুদর্শাগ্রস্ত, পীড়িতদের পিলপিল করে রাস্তাজলজমির আনাচ-কানাচ ভরিয়ে তোলা তাকে আশঙ্কিত করেছে। মনে করিয়েছে যেন ভিড় বেড়ে গেছে। আসলে সুকান্ত তাদের আতর্নাদে নিজে পীড়িত হতেন। অসীম আশাবোধে উদ্দীপ্ত সুকান্ত'ও কখনও কখনও সাক্ষাৎ মৃত্যুমিছিল দেখে, সাম্রাজ্যবাদের লৌহনখর দেখে, পরাধীনতার ভুখা গ্লানি দেখে মৃত্যুকে আপন ভাবতেন। অরুণাচল দত্তকে লিখছেন এক চিঠিতে,

"আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমি গেলাম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর, পরম মুহূতের্র সন্ধানে। তবু আমার ক্লান্তি আসছে, ক্লান্তি আসছে এই অহেতুক বিলম্বে।"

কিম্বা যখন 'রাখাল ছেলে' কবিতায় স্কুলপড়ুয়া সুকান্ত লিখছেন, "ডেকো না গো তোমরা আমায়/ চলে যাবার বেলা,/ রাখাল ছেলে খেলবে না আর/ মরণ-বাঁশির খেলা॥"

তখন কিশোর সুকান্তকে এই হীনতার বোধ থেকে মুক্তি দিত কবিতা-ই, তার লেখা, তার সৃজন যা ছিল সূযের্র মতন। কলকাতা ছেড়ে তিনি ঘুরতে যেতেন যখন বাইরে, আকণ্ঠ পান করতেন সে স্থলের মাধুরী। কাশ্মীরের নিসগর্ আর কাশী'র ঐতিহাসিকতা যেন ছিল তার লেখকজীবনের গ্রন্থিমুক্তি।

"কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত Observatory মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজ থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ।"

জীবনের শেষ কিছু বছরে, যুদ্ধের ছায়া যখন কেটে গেছে, তখনও দরিদ্রমিছিল কলকাতার রাস্তায় আরও লম্বা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে রোমান্টিক প্রণয়-স্বাস্থ্যহানি-মানুষের মৌলিক দাবি কীভাবে আরও সঠিকতর লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় ইত্যাদি নিয়ে জেরবার তখন কিশোর-কবির অন্তর থেকে উঠে এসেছে এই প্রশ্ন, "কলকাতা কি স্বাভাবিক হচ্ছে?"

সুকান্তের গল্পেও কমবেশি মহানগর হতে চলা কলকাতার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের potential আর সীমাবদ্ধতার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

“কেমন যেন নেশা লেগে গেছে তার: পয়সা- আরো পয়সা; একটি লোককে, একটি মালকেও সে ছাড়বে না বিনা পয়সায়।” - ‘ভদ্রলোক’ গল্পে কন্ডাক্টরের এই উপাজর্নের নেশা আসলে টাকাসবর্স্বতার যুগের মূল্যবোধের স্বরূপ। আশি বছর পেরিয়ে এই মূল্যবোধ কেবলই জাঁকিয়ে বসেছে। তবে এই কি একমাত্র? মানুষ কি আর সুসংবাদের প্রত্যাশা করে না?

“এ-প্রতীক্ষা চালের জন্যে, না বিপ্লবের জন্যে?”- ‘ক্ষুধা’ গল্পে তোলা এই প্রশ্ন অনেক পরে অনীক দত্তের এক মজার সিনেমার মধ্যে দিয়ে ‘বিপ্লব-প্রত্যাশী’ মধ্যবিত্ত বাঙালি পুনরাবিষ্কার করে। তারই সঙ্গে তারা এ-ও জানে আশি বছর ধরে একই ব্লুপ্রিন্ট চল আসছে, বিপ্লব যারা চাইবে তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে। ‘দেবতাদের ভয়’ গল্পে দেবতার রূপকে শাসক শ্রেণি অথর্াৎ তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও এখন তাদের শুভানুধ্যায়ী কর্পোরেট-চালিত সরকারসমূহ ঠিকই জানে, “ওদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটিটা যদি বজায় রাখা যায় তা হলেই ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে মারা পড়বে, আমরাও নিশ্চিন্ত হব।”

সুকান্তকে এই ঘেরাটোপে বেঁধে রাখা সহজ ছিল না। কারণ সুকান্ত যে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে ছিলেন স্থিরসংকল্প তাতে তার ব্যক্তিজীবনের নানা টানাপোড়েন, সংকট ছাপিয়ে কেবলই ধ্বনিত হয়েছে ওই স্থির ভবিষ্যতের দ্যোতনা।

সুকান্ত দেখেছেন কীভাবে মুষ্টিমেয় জন মানুষকে বোকা বানায়, তাদের পরিশ্রমের মূল্য দেয় না, মূখর্ বানিয়ে রাখতে চায় মানুষকে।

“পথ চলতে ভেবে এসব ভিজে ওঠেন ঘামে,
মানিকতলা যেতে চাপেন ধমর্তলার ট্রামে।
বরেনবাবু জানেন কিন্তু নানা রকম বিজ্ঞান,
জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন তিনি তাইতো এমন দিক্-জ্ঞান॥”

জ্যোতিষশাস্ত্রের অপবিজ্ঞানের প্রতি এখানে কেবল শ্লেষ কটাক্ষ করা হয়নি, আসলে কিশোর মন থেকেই মানুষ যাতে প্রশ্ন করতে শেখে, বিজ্ঞানমনস্ক হয় তা-ই ছিল সুকান্তের আকাঙ্ক্ষা। তার ছন্দ, বক্তব্য, অলঙ্কার সমস্ত কিছু তাই চালিত হয়েছে সরল বাক্যে সহজ কথায় মানুষের মনে শ্রেণিসংঘাতের হরেক রূপ গেঁথে দিতে।

“ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,/ ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।” এই কবিতার পংক্তি আমাদের সমকালীন চুরিসবর্স্ব, ভেজালসবর্স্ব সরকারি সিস্টেমেটিক ক্রাইসিসকেও ধরতে পারে প্রায় শতাব্দী পেরিয়ে। যেমনি ধরতে পারে সভ্যতার হাহাকারকে। যখন মানুষের তৈরি মন্বন্তর দেশের পর দেশ, প্যালেস্টাইন থেকে লিবিয়া, বিদভর্ থেকে ঘাটাল ছারখার করে দেয়।

“আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,

প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।”

কার কী ধর্ম, জাত, বর্ণ, দেশ— সে প্রশ্ন হয়ে ওঠে গুরুত্বহীন তখন। এক ভুখা মানুষ আরেক ভুখা মানুষকে তার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বন্ধু বানিয়ে ফেলে। গড়ে উঠতে থাকে ঐক্য। গ্রাম থেকে শহর। বস্তি থেকে মহল্লা।

“আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐক্যতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।”

সুকান্ত সরাসরি পাঠকের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন। অজর অমর বাণীতে। “মৃত্যুকে ভুলেছ তুমি তাই,/ তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সবর্দাই।” বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে সুকান্ত জেদি একগুঁয়ের মতন তার, তাদের অথর্াৎ উৎপীড়িতদের মমর্স্থল থেকে বের করে আনেন সদপর্ ঘোষণা:

“আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর॥”

ঢিমেতালে চলা জীবন গতি পায়। সুকান্তের অক্ষরে মেশে রাগ, প্রীতি, জীবনবোধ। গভীরতর ক্ষত বুকে জায়গা পেলেও তা ম্লান করে দিয়ে সুকান্তের কথা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল,

“সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি-
দুর্বল মন, দুর্বলতর কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দীঘির জল
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া॥”

সেই ছায়াতে সুকান্ত প্রত্যক্ষ করেন, “হাতছানি দিয়ে গেল শস্যের উন্নত শীষ,/ জনযাত্রায় নতুন হদিশ—” এই হদিশ পেতে গেলে মিনমিন করলে চলবে না, হতে হবে মুখরা, প্রত্যয়ী। ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ সুকান্তের উৎসগর্ করা কবিতায় সুকান্ত লিখছেন,

“তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির লালিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।”
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥”

সুকান্তের শব্দচয়নের সূচিমুখ ছিল বরাবর মানুষের উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে। আমাদের বতর্মান সেই ভবিষ্যৎ রচনার সোপান। আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকলে সেই ভবিষ্যৎ আরও দূর সরতে থাকবে। সুকান্তের কথার, জীবনের সারমমর্ একবাক্যে এইটাই।